মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.

মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা

মূল
মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ নিজাম উদ্দীন

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

ভূমিকা

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، ولاسيما على سيدنا المجتبى
ومن هذه الهدى.

কিছুকাল পূর্বে কয়েক বুযুর্গের ঘটনা ও নানা রকম রচনা অধ্যয়ন হয়েছিল আমার। সেগুলোর মাধ্যমে অন্তিম সময়ে মানুষের সামনে শয়তানের আবির্ভাব এবং সেই নাযুক মুহূর্তে মানুষকে ঈমানহারা করতে তার বহুবিধ চতুরতার জ্ঞান লাভ হয়। তখনই ছোট্ট কলেবরে একটি বই লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, যেটি হবে শয়তানি ছলনার বিবরণ এবং সেই অপপ্রয়াস থেকে আত্মরক্ষামূলক আমলসমূহের বর্ণনাপত্র। কিন্তু ব্যস্ততা ও বেখেয়াল আমাকে সুযোগ দিল না। ফলে আমার ইচ্ছাটিও রূপ পেল না অস্তিত্বের।

ঘটনাপ্রবাহে গত ১৯ জিলক্বদ ১৩৫৬ হিজরীতে আমার শ্রদ্ধাস্পদ চাচা মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম দেওবন্দী পরলোকগমন করেন। রূহ কবযের সময় আমি অধমের সম্মুখেই প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত শয়তানের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ চলতে থাকে। এ অদ্ভুত দৃশ্যপট সেদিনই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম।

মরহুম মাওলানার পেরেশানি ও তাঁর উপদেশপূর্ণ ঘটনা পুরনো ইচ্ছাকে তাজা করে দিল।

সে সময়ই লিখা হয়েছে এ-কয়েক পৃষ্ঠার বইটি। এ-ক্ষুদ্র বইটিতে প্রথমত লিখেছি শয়তানের উপদ্রব সম্পর্কে সহজ-সাবলীল বিষয়গুলোকে। তাউপর যোগ করে দিয়েছি মরহুম মাওলানার সংক্ষিপ্ত অবস্থা, যা 'আন-নাঈমুল মুক্বীম' শিরোনামে বইটির শেষাংশে সংযুক্ত।

যে সকল মুসলমান ভাই-বোন এ-বই থেকে উপকৃত হবেন, তাদের কাছে বিনীত আবেদন এই যে, সকলেই আপনাপন দুআয় এই অধম ও মরহুম মাওলানাকে শরীক করবেন। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

বান্দা মুহাম্মাদ শফী
খাদেম, দারুল উলূম দেওবন্দ
২১ সফর, ১৩৫৭ হিজরী

সূচী

মৃত্যুর সময় শয়তানের প্রবঞ্চনা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

احضروا موتاكم ولقنوهم "لا إله إلا الله" وبشروهم بالجنة، فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع.

'তোমরা আসন্ন-মৃত্যু লোকদের (মুসলমান) কাছে উপস্থিত হইও। তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন করো। সুসংবাদ প্রদান করো বেহেশতের। কারণ, বড় জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ মানুষও (পুরুষ-মহিলা) সেই কঠিন সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে শয়তানও সে মুহূর্তে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি কাছাকাছি হয়।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৭৮)

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন,

احضروا موتاكم وذكروهم، فإنهم يرون ما لا ترون.

'তোমরা মরণাপন্ন লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ো। তাদের আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিয়ো। এই জন্য যে, তারা সেই মুহূর্তে এমন এমন জিনিস দেখতে পায়, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১১)

হযরত উমর রাযি.-এর অন্য এক বর্ণনা নিম্নোক্ত শব্দেও উল্লেখ আছে,

فإنهم يرون ويقال لهم.

'এই জন্য যে তারা কিছু একটা দেখতে পায় এবং তাদের কিছু বলা হয়ে থাকে।' (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১১১)

বাক্যটির উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, শয়তান তাদের প্ররোচনা ও প্রণোদনামূলক কথাবার্তা বলে থাকে।

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে দুনিয়ার বুকে অবতরণ করালে শয়তান তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে নেমে এল উল্লাস প্রকাশের জন্য। আর গর্বভরা ভাষায় বলল, 'যখন আমি ফুসলিয়ে ফেলেছি মাতা-পিতাকেই, তখন তাদের সন্তানসন্ততি তো অতিমাত্রায় দুর্বল।' (তাদের ধোঁকা দেয়া কী আর কঠিন ব্যাপার!) এটিই ছিল শয়তানের ধারণা। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

'আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল।' (সূরা সাবা, আয়াত ২০)

এ ভিত্তিতেই ইবলীস বলেছে, 'মানুষের ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত আমি তার থেকে পৃথক হব না। আমৃত্যু তাকে ধোঁকা দিয়েই যাব; মিথ্যা আশা ও নানাবিধ ওয়াদার বেড়াজালে আটকিয়ে।'

কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানও শয়তানের বিপরীতে দীপ্তভাষায় ঘোষণা করেছেন,

وعزتي وجلالي! لا أعجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له.

'শপথ আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের! বান্দা মৃত্যুকষ্টে ছটফট করার আগ পর্যন্ত আমি বিরত থাকব না তার তওবা কবূল করা থেকে। বান্দা ডাকলেই আমি সাড়া দিব তার ডাকে। চাওয়া মাত্রই আমি দান করব তাকে। ক্ষমা চাইলে ক্ষমাও করব তাকে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫)

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী'তে লিখেছেন, কোনো কোনো রিওয়ায়াতে পাওয়া যায়, মানুষ মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলে দুই শয়তান তার ডান ও বাম পাশে উপস্থিত হয়। ডানপাশের শয়তান মুমূর্ষু ব্যক্তির বাবার আকৃতি ধারণ করে বলে, 'বৎস! আমি তোমাকে স্নেহ ও মায়া করি। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ হল, তুমি খৃস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করো। কারণ, এটিই উত্তম ধর্ম।' অপরদিকে বামপাশের শয়তান তার মায়ের রূপ

অবলম্বন করে বলে, ‘বৎস! আমার গর্ভে তোমাকে ধারণ করেছি। তুমি পান করেছ আমার বুকের দুধ। আমার কোলে পিঠেই তোমার লালন-পালন। আমি তোমার ভালো চাই। তাই তোমাকে আমার পরামর্শ এই যে, তোমার ইহুদী ধর্মাবলম্বী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া উচিত। কেননা এটিই একমাত্র উত্তম ধর্ম।’

অনুরূপ বিষয় ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর রচিত ‘আদ্ দুররাতুল ফাখিরাতু ফি কাশফি উলূমিল আখিরাতি’ নামক কিতাবের মধ্যে লিখেছেন। সেখানকার আলোচনা এই যে, মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণার সময় যখন মহাজ্ঞানী-গুণীজনদের বিচার-বিবেচনাও অসাড় হয়ে পড়ে, তখন শয়তান সজ্ঘবদ্ধ হয় আপন অনুচর-পরিচরদের নিয়ে। নিমিষেই পৌঁছে যায় মরণাপন্ন ব্যক্তির দ্বারপ্রান্তে। দুরাত্মাগুলো সে সময় আবির্ভূত হয় মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রয়াত নেককার স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীর বেশবেশী হয়ে।

তারা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, ‘আমরা মৃত্যুঘাঁটি অতিক্রম করেছি তোমার পূর্বে। এ ঘাঁটির আদ্যোপান্ত সবকিছুই আমাদের জানাশোনা। এবার তোমার পালা। আমরা তোমাকে সদুপদেশ দিচ্ছি, তুমি ইহুদী ধর্মাবলম্বী হয়ে যাও। সেটিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।’

মরণাপন্ন ব্যক্তি যদি প্রেতাত্মাগুলোর প্ররোচনামূলক আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে অন্য একদল শয়তান তার অন্যান্য নিকটতম ও অন্তরঙ্গদের বেশ ধরে আবির্ভূত হয় এবং ফুসলিয়ে বলে, ‘তুমি খৃস্টান বনে যাও। এটি চমৎকার ধর্ম; এ ধর্মই মূসা আলাইহিস সালামের আনীত ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে।’

এভাবেই শয়তানেরা বিভিন্ন ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাস প্রক্ষেপ করে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের অন্তরে। সুতরাং যার কপালে সঠিক ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি লেখা আছে, তার পদস্খলন ঘটে যায়। জীবন-সায়াহ্নে মিথ্যা ধর্ম অবলম্বন করে দুনিয়া হতে বিদায় হয় ঈমানহারা অবস্থায়।

এজন্যই ঈমানের মজবুতির জন্য আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً.

‘হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮)

সম্ভবত হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী এ-ব্যাপারেই মছনবী শরীফে লিখেছেন,

تاچه دارد ایں حسود اندر کدو ☆ اے خدا فریاد رس ما زیں عدو

'হে আল্লাহ, এই শত্রুর মুকাবিলায় আমাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করুন। জানি না এই হিংসুক কী গোপন চক্রান্ত করছে।'

گر یکے فصل دگر بر من دمد ☆ برد خواہد از من ایں رہزن نمد

'আরেকবার যদি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ডাকাত আমার ঈমানের শেষ চটখানিও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।'

ایں حدیثش ہمچو دوست اے الہ ☆ رحم کن ورنہ گلیم شد سیاہ

'তার এই কথাবার্তা (অন্তর কালো করার ব্যাপারে) ধোঁয়া সদৃশ। হে আল্লাহ, রহম করুন নতুবা ওর দ্বারা আমার (ভাগ্যের) চাদর কালো হয়ে যাবে।'

من بحجت بر نیایم با بلیس ☆ کوست فتنہ ہر شریف وہر خسیس

'আমি তর্কে ইবলীসের মুকাবিলা করতে পারব না। কেননা সে ভালো-মন্দ সকল লোককেই বিপদে ফেলতে পারে।'

সেই অন্তিম মুহূর্তে যার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, সে সৌভাগ্যবানই ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকতে পারে। তাইতো আল্লাহর রহমত নিয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে উপস্থিত হন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। তিনি প্রতিহত করেন শয়তানকে মরণাপন্ন ব্যক্তির আশপাশ থেকে। ফলে অনেক সময়ই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি অতিশয় স্বস্তি ও উৎফুল্লের দরুন মুচকি হাসি দেয়।

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, 'হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পার নি? আমি জিবরাঈল। আর তোমার সামনে ওরা সকলেই তোমার দুশমন— শয়তান। তুমি ওদের কথায় কর্ণপাত করো না। তুমি তোমার সরল সঠিক শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া ইবরাহীমিয়ার (ইসলাম) উপর অবিচল থেকো।' সে সময় মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক ও প্রশান্তিকর আর কিছুই হয় না। নিম্নোক্ত আয়াতটি সে সাক্ষ্যই বহন করে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ ইহকালীন জীবনে ও পরকালীন জীবনে।' (সূরা ইউনুস, আয়াত ৬৩-৬৪)

ইমাম কুরতুবীর পরলোকগমন ও শয়তানের ধোঁকা

ইমাম আবু জাফর কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে উপস্থিত লোকজন তাঁকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার তালকীন করল। তিনি لا (না) বলছিলেন তাদের জওয়াবে। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে কিছু সময় পর তিনি চোখ মেললেন।

তখন লোকজন কৌতূহল প্রদর্শন করল; কালিমার তালকীনের সময় তাঁর না-সূচক উত্তর প্রদানের রহস্য জানার জন্য।

তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের প্রত্যুত্তরে তা বলি নি। আসলে সে সময় দুটি শয়তান আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওদের একজন আমাকে বলছিল, আমি যেন খৃস্ট ধর্ম অবলম্বন করে মৃত্যুবরণ করি।

অপরজন আমাকে ইহুদী হয়ে দুনিয়া ছাড়ার আহ্বান করছিল।

আমি তৎক্ষণাৎ ওদের প্রবঞ্চনা প্রত্যাখ্যান করে 'না না' বলছিলাম।'

আমি ওদের মুখের উপর আরও বলছিলাম, তোরা আমাকে মৃত্যুকালীন পাঠ দিচ্ছিস? অথচ আমি নিজ হাতে তিরমিযী শরীফ ও নাসাঈ শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ-হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি যে-

إن الشيطان يأتي أحدكم قبل موته، فيقول له : مت يهوديا، مت نصرانيا.

'শয়তান তোমাদের কারও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে প্ররোচনা দিয়ে বলে যে, তুমি ইহুদী হয়ে মরো, খৃস্টান হয়ে মরো।'

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার পর বললেন, 'অনেক নেককার মানুষই মৃত্যুর সময় সম্মুখীন হয়ে থাকেন এ-ধরনের পরিস্থিতির। কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালকীন করাকালে বাহ্যদৃষ্টিতে তাদের মুখের ভাষাকে মনে হয় কালিমার অগ্রাহ্যকরণ হিসেবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন শয়তানের কু-মতলব, কু-মন্ত্রণা।'

হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মানুষ মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেলে তার সামনে পেশ করা হয় তার বন্ধু-বান্ধবদের। মরণাপন্ন ব্যক্তি আড্ডাবাজ ও বিলাসপ্রিয় হয়ে থাকলে তার সাথীগুলো হয় বদকার। বিপরীতে সে ভালো মানুষ হলে সঙ্গীগুলো হয় নেককার।

ফায়দা: এজন্যই মানুষের উচিত উদাস ও আমুদে লোকদের সঙ্গ থেকে দূরে অবস্থান করা।

শয়তানের মুকাবিলায় ফেরেশতাদের সহায়তা ও সুসংবাদ

چوں عنایاتت بود با ما مقیم ☆ کے بود بیمے ازاں دزد لئیم

'হে মা'বুদ, আপনার অনুকম্পা যখন আমাদের সঙ্গে আছে তখন কুখ্যাত চোরের ভয় কী?'

گر ہزاراں دام باشد در قدم ☆ چوں تو با مائی نہ باشد ہیچ غم

'যদি আমাদের প্রতিপদে হাজার হাজার ফাঁদ ও জাল থাকে, তবুও আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদের কোনো চিন্তা নেই।'

নিঃস্ব, দুর্বল, দীর্ঘদিনের রোগাক্রান্ত, শিরায় শিরায় ক্ষত, অকস্মাৎ চৈতন্যহারা প্রভৃতি লোকদের প্রাণবিয়োগের দুর্ভোগ, অধিকন্তু মৃত্যুঘাঁটির ভীতিপ্রদ ও বিপদসঙ্কুল সেই স্থানে স্বরূপ বদলিয়ে মাতা-পিতা ও আত্মীয়স্বজনের বেশভূষায় শয়তানের হামলা, তদুপরি কল্যাণকামী উপদেশদাতার ভঙ্গিমায় ওদের আবির্ভাব হওয়া— এ সামগ্রিক বিষয় কল্পনা করা হলে খেয়াল আসবে যে, সম্ভবত কোনো মানুষই সেই কঠিন মুহূর্তে স্থিরকদম থাকতে পারে না।

কিন্তু শয়তানের কী ক্ষমতা থাকতে পারে যখন বিশ্বনিয়ন্তা মহান করুণাময় আল্লাহ পাক স্বয়ং বন্ধু হয়ে আছেন?

چوں ہزاراں دام باشد در قدم ☆ چوں تو با مائی نہ باشد ہیچ غم

'যখন আমাদের প্রতিপদে হাজার হাজার ফাঁদ ও জাল থাকে, তবুও আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদের কোনো চিন্তা নেই।'

کیمیا داری کہ تبدیلش کنی ☆ گرچہ جوئی خوں بود نیلش کنی

'আপনি তো পরশপাথরের মালিক, আপনি তাকেও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন, আপনি চাইলে রক্তের লাল বর্ণকেও নীল করতে পারেন।'

এ-মৃত্যুঘাঁটি যেমনি কঠিন মুহূর্তের, ভয়াবহ দৃশ্যের, বিভীষিকাময় স্থানের, তেমনি দয়ার সাগর, ক্ষমার আকর আল্লাহ পাকও অসহায় বান্দাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য রসদ প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ আছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ .

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।' (সূরা হা মিম সেজদাহ, আয়াত ৩০-৩২)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে দুটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়। যেগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের তাফসীর উল্লেখ করা হয়।

প্রথমত: استقامت (দৃঢ়তা ও অবিচলতা)

দ্বিতীয়ত: تنزل الملائكة (ফেরেশতাদের অবতরণ)

'ইস্তিক্বামাত' শব্দের বিভিন্ন তাফসীর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণে সেগুলো অভিন্ন। বরং 'ইস্তিক্বামাতের' বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বন করা হয়েছে এর স্তরের বেশ-কম বিবেচনা করে। সেগুলোর মাঝে হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর রাযি.-এর তাফসীর হল সবচেয়ে চমৎকার। তিনি বলেন, 'ইস্তিক্বামাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'ঈমান ও তাওহীদের উপর ইস্তিক্বামাত। অর্থাৎ ঈমানের উপর

অটল ও অবিচল থাকা, কুফর ও শিরকে জড়িয়ে না পড়া।' এ তাফসীরটি অন্য তাফসীরগুলোকে শামিল করে নেয়।

'তানাযযুলুল মালাইকা' এর ব্যাপারেও বিভিন্ন তাফসীর উল্লেখ করা হয়। কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, ফেরেশতারা মৃত্যুর সময় মানুষকে সহায়তা করতে অবতরণ করে। কেউ বলেছেন, ফেরেশতারা মানুষকে সহায়তা করে কবরে। কেউ বলেছেন, ফেরেশতারা মানুষকে সহায়তা করবে কিয়ামতের ময়দানে।

কিন্তু ইবনে কাসীর হযরত যায়েদ বিন আসলাম রাযি. থেকে নিম্নোক্ত তাফসীর উল্লেখ করেছেন,

يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث.

'ফেরেশতারা মানুষকে মৃত্যুর সময় সুসংবাদ প্রদান করেন, তারা সুসংবাদ দেন কবরেও এবং তারা সুসংবাদ দিবেন কিয়ামতের মাঠেও যখন মানুষ পুনরুত্থিত হবে।' এটি অন্যান্য তাফসীর থেকে ব্যাপক। এটিই উত্তম ব্যাখ্যা। এমনটিই হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

মোটকথা, আয়াতে কারীমার মাধ্যমে একথা একদম স্পষ্ট, যে ব্যক্তি জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত ইসলাম ও ঈমানের উপর দৃঢ়কদম থাকে, তার মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তার শিয়রে অবতরণ করে এবং তাকে খোশখবর শোনায়।

তাফসীরগ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে আছে, আসমান থেকে প্রেরিত ফেরেশতাগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির সকল কাজকর্মে সাহায্য করেন। ইহকালীন-পরকালীন যেকোনো ধরনের চিন্তা বা পেরেশানি মুমূর্ষু ব্যক্তির সামনে পেশ হয়, ফেরেশতাগণ সে ক্ষেত্রেই তাকে সহযোগিতা করে থাকেন। তারা তার অন্তর হতে সমূহ পেরেশানি দূর করেন এবং উদ্ধার করেন তাকে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকেও।

উপরে উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানদের দুটি জিনিস হতে নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন থাকার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এক– ভয় ও আশঙ্কা।

দুই– দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি।

ভয় ও আশঙ্কা তো সে সকল জিনিসের বেলায় হয়ে থাকে, যা ভবিষ্যতে তার সামনে পেশ হবে। যেমন: কবর, হাশর ও নাশর ইত্যাদির ভয়।

আর দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি তো সে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যা পিছনে ছেড়ে আসা হয়। যেমনঃ পরিবার-পরিজনের জন্য দুশ্চিন্তা।

সুতরাং মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সান্ত্বনামূলক কথাবার্তার অর্থ এটিই যে, তোমরা সামনের বিপদাপদের ব্যাপারে শঙ্কিত ও ভীতিগ্রস্ত হয়ো না। কেননা আমরা প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সহায়তা করতেই। আর তোমরা দুনিয়াতে যে সকল আপন লোকজনকে ছেড়ে যাচ্ছ, তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও পেরেশান হয়ো না। কারণ আমরা তো আছিই তাদের দেখাশোনা করার জন্যে।

উপরে 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী'র বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ও অপরাপর ফেরেশতাগণ শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছ থেকে এবং তাকে তাকিদ করতে থাকে সঠিক দীনের উপর স্থির থাকার জন্য।

হযরত মাইমুনা বিনতে সা'দ রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, গোসলের হাজতওয়ালা ব্যক্তি যদি গোসল ছাড়া শুয়ে থাকে তবে কোনো সমস্যা আছে কি না?

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ فإني أخاف أن يتوفى، فلا يحضره جبريل.

'আমি পছন্দ করি না যে, গোসলের হাজতওয়ালা ব্যক্তি অযু ছাড়া শুয়ে থাকবে। কারণ আমার আশঙ্কা হয়, তার শয়নকালে হঠাৎ মৃত্যু এসে গেল। কিন্তু তার শিয়রে জিবরাঈল ফেরেশতা উপস্থিত হলেন না।' (আল হাবী লিসসুয়ূতি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫২)

এ-হাদীসের মাধ্যমে জানা গেল, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে তাশরীফ নিয়ে যান। কিন্তু ব্যক্তি যদি জুনুবী অবস্থায় (যার উপর গোসল ফরয) মারা যায়, তাহলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হন না তার জানাযায়।

মোটকথা, মৃত্যুর সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর রহমত ধাবিত হয় মু'মিনের দিকে। মু'মিনকে সহায়তা ও দীনের উপর তার অবিচলতার জন্য তার শিয়রে প্রেরণ করা হয় ফেরেশতাদের। তারা শয়তানকে হটিয়ে দেন

মৃতপ্রায় ব্যক্তির আশপাশ থেকে।। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক করে তোলেন তার থেকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে।

অবশেষে প্রেরিত ফেরেশতাদের সহযোগিতায় মু'মিন-মুসলমান এত পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, শয়তানের কু-মন্ত্রণা তার সামনে কোনো কিছুই নয়। তারা সেই নাযুক মুহূর্তে শয়তানের এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চাল ও ফাঁদ বুঝে ফেলেন, অনেক জ্ঞানবান মানুষও সেক্ষেত্রে হোঁচট খেয়ে যায়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মৃত্যুঘটনা

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহির ছেলে বর্ণনা করেছেন, আব্বাজানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আমি তাঁর চোয়াল বাঁধার জন্য হাতে কাপড় নিয়ে রেখেছিলাম। সে মুহূর্তে তিনি দরদর করে ঘামছিলেন। চৈতন্যশক্তি ফিরে পেলেই তিনি বলছিলেন, "لا بعد"।

তাঁর এ-অবস্থা কয়েকবার অবলোকন করার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আব্বাজান! আপনি কী সব বলছেন?'

তিনি বললেন, 'আমার সম্মুখে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বজ্জাত মুখে আঙ্গুল রেখে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'হে আহমদ, আমাদের আফসোসের ব্যাপার, তুমি আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছ।'

আমি ওর জবাবে বলছি, لا بعد। অর্থাৎ আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোদের হাত থেকে নিরাপদ নই। (কেননা শেষ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত আমি তোদের দুর্বৃত্তপনা হতে উদাস ও অন্যমনস্ক হতে পারি না।)

মূলত শয়তান তাঁকে সে মুহূর্তে উদাসীন ও আনমনা করে আচমকা তাঁর ঈমানের উপর হামলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি শয়তানি চতুরতা বুঝে ফেলেন এবং যথাযথ জবাব দেন। সুবহানাল্লাহ!

অসংখ্য নেককার লোকজন এ-ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাঁরা শয়তানের অপপ্রয়াসের জবাব দিয়েছেন।

মৃত্যুকালে শয়তানের সঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বাদানুবাদ— প্রসিদ্ধ ঘটনা, তাই তা উল্লেখ করছি না।

সারকথা, মৃত্যুর সেই সঙ্গিন মুহূর্তে তারাই শয়তানের দুরভিসন্ধির শিকারে পরিণত হয়, যাদের ঈমান দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত।

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার কারণ

উপরে উল্লেখিত সমূহ আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয়, ঈমান ও জানের দুশমন শয়তান মানুষের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার ঈমানের উপর অতর্কিত হামলা করে। আর সে সময় কোনো বান্দাই শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারে না আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের মদদ ছাড়া।

আলোচিত আয়াতের মাধ্যমে এ-কথাও বুঝে আসে, মৃত্যুর সেই সঙ্গিন মুহূর্তে ঈমানওয়ালা ও ঈমানের উপর অবিচল ব্যক্তিদের কপালেই জুটে আল্লাহর দয়া ও করুণা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য ও সহযোগিতা।

পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার নয়, তারা সে সময়ও আটকে থাকে শয়তানের খপ্পরেই, যেমনিভাবে জীবনভর তারা ছিল শয়তানের বিড়ম্বনার শিকার। শেষ পরিণাম হিসেবে আল্লাহর রহমত ও সুসংবাদ এবং ফেরেশতাদের মদদ ও নুসরত থেকে তারা শুধু বঞ্চিতই নয়; বরং জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি ও দুর্ভোগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় চিরদিনের জন্য। অনুরূপ যারা ঈমানওয়ালা তবে আপন ঈমানের উপর বলবৎ নয় তারাও সে মদদ ও রহমত থেকে মাহরূম হয়।

ঈমানের উপর বলবৎ না থাকার কয়েকটি স্তর আছে।

প্রথমত: (আল্লাহ হেফাযত করুন!) আপন ঈমান নষ্ট করে ফেলা।

দ্বিতীয়ত: লাগাতার এমনভাবে গুনাহে জড়িয়ে যাওয়া, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে লেশমাত্র আল্লাহভীতি না থাকাটা প্রকাশ করে; অথচ আল্লাহভীতিই হল ঈমান ও ইস্তিক্বামাতের মূল। এ ধরনের লোকজনও মৃত্যুর সময় শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়।

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী'র মধ্যে এরকম অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেখানকার কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি—

এক দালালের ঘটনা। সে দিনরাত ব্যস্ত সময় পার করত ব্যবসা-বাণিজ্যের ধান্ধায়। বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করত না নামায-রোযা ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি। সে মরণোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হলে তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকীন করা হল। কিন্তু তার হাতমুখ নড়চড় করছিল ব্যবসার

হিসাব-নিকাশেই। তার কালিমা নসীব হল না। অবশেষে সে বেঈমান হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিল।

এমনি আর এক ব্যক্তি দুনিয়ার মাঝে ডুবে ছিল। দীন-ধর্ম ও ইবাদত-বন্দেগীর বেলায় ছিল একেবারেই উদাস। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আশপাশের লোকজন তাকে কালিমার তালকীন করল। কিন্তু সে বলছিল, 'তোমরা আমার গাধাটাকে ঘাস খাইয়েছ তো?'

অনুরূপ এক বাজারি ব্যক্তি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছল। তাকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে তার হিসাব-নিকাশ ও ভাগ-বাটোয়ারাতেই মশগুল ছিল। অবশেষে এ হালতেই সে দুনিয়া ছাড়ল।

এমনি এক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পরিমাপ করত। কিন্তু ওজন করার পূর্বে দাঁড়িপাল্লাকে সঠিকভাবে পরিষ্কার করত না। ধুলোবালির দরুন ওজনে কম হয়ে যেত। মৃত্যুর সময় লোকজন তাকে কালিমা পড়ার তালকীন করল। তখন সে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান, আমি সব ধরনের কথাবার্তা বলতে পারছি জিহ্বা দিয়ে। কিন্তু যখনই কালিমা পড়তে উদ্যত হই তখন আমার জিহ্বা ওঠে না। কারণ আমার জিহ্বার উপর দাঁড়িপাল্লার কাঁটা রেখে দেয়া হয়েছে। তা এই জন্য যে আমি ওজন করার সময় দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিকভাবে পরিষ্কার করতাম না। দুআ করো, আল্লাহ্ যেন আমাকে মাফ করে দেন।'

ফায়দাঃ সম্ভবত এই লোক জেনে-বুঝে ইচ্ছে করেই মাপে কম দিয়ে সুখানুভব করত; নতুবা সতর্কতা সত্ত্বেও বেখেয়ালে এরূপ হয়ে গেলে অমন শাস্তি হওয়ার কথা নয়।

অনুরূপ এক ব্যক্তি অন্তিম সময়ে উপনীত হলে লোকজন তাকে কালিমার তালকীন করল। তখন সে বলল, 'আমি কালিমা পড়ার শক্তি পাচ্ছি না। কেননা আমি এ মুখ দিয়ে পড়শী-প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতাম।'

এমনি এক ব্যক্তিকে তার রূহ কবযের আগমুহূর্তে কালিমা পড়তে বলা হল। সে বলল, 'আমার তা পড়ার শক্তি নেই।' লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভেবে দেখ তো, কোন্ গুনাহের দরুন তোমার এ পরিণতি?' সে বলল, 'আমি জীবনে একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলাম।'

এ যাবতীয় ঘটনার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে, কখনো কোনো কোনো গুনাহ্ কালিমা পড়ার তাওফীক হতে মাহরূম হওয়া ও শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এরূপ পরিণতির মূল কারণ এটাই যে উদাস হয়ে একের পর এক গুনাহে জড়িয়ে পড়া, তারপর তওবাও না করা, উপরন্তু দিলে আল্লাহভীতিও না থাকা।

অবশ্য ছোটখাটো সাধারণ গুনাহের শাস্তি এত কঠিন ও ভয়াবহ হওয়ার কথা নয়। কেননা দুনিয়াতে কে এমন আছে যে, সে কখনো কোনো গুনাহই করে নি?

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন তার 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী' নামক কিতাবে, যা এই বইয়ের উপসংহারে উল্লেখ করা হবে।

হযরত মাইমুনা রাদিআল্লাহু আনহার হাদীস উপরে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সেই ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হন না, যে জুনুবী অবস্থায় অযু ছাড়া শুয়ে পড়ে এবং এ-হালতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেননা যেখানে জুনুবী ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে ফেরেশতারা আনাগোনা করে না। অবশ্য যদি জুনুবী ব্যক্তি অযু করে নেয় (অথবা অযুর সামর্থ্য না থাকলে তায়াম্মুম করে) তাহলে ফেরেশতাদের বিমুখতা দূরীভূত হয়।

আলোচিত হাদীস থেকে এ-কথা বুঝা গেল যে, যেখানে ফেরেশতাদের বিমুখতার বিষয় আছে সেখানে তারা যাতায়াত করে না। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যেহেতু জানাবাত ফেরেশতাদের বিমুখতার কারণ, সেহেতু জুনুবীর কাছে তখন ফেরেশতাদের আসা-যাওয়া হয় না। অতএব ফেরেশতাদের বিমুখতার কারণ (তথা জুনুবী হওয়া) যদি মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়, তাহলে সে মাহরূম হবে ফেরেশতাদের সহযোগিতা থেকে। এমতাবস্থায় তার শয়তানের জালে আটকে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যে সকল জিনিসের কারণে রহমতের ফেরেশতা নিকটবর্তী হয় না, তা অনেক। সেগুলোর মশহুর কয়েকটি হল: কুকুর, প্রাণীর ছবি, বাদ্যযন্ত্র, গোসলের হাজতওয়ালা পুরুষ কিংবা মহিলা (জুনুবী হোক, হায়েযওয়ালী হোক, নেফাসওয়ালী হোক)।

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'যে ঘরে মহিলারা খোলা মাথায় অবস্থান করে, সেখানেও রহমতের ফেরেশতা পদার্পণ করে না।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যে ঘরে পেশাব কোনো পাত্রে জমা করে রাখা হয়, সেখানেও রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

আলোচিত রিওয়ায়াতগুলো 'শিফাউল ইসলাম ফিমা তানফাররু আনহুল মালাইকাতুল কিরাম' কিতাবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা আছে।

জরুরী পরামর্শ: আফসোস! আজকাল মুসলমানদের মাঝে কুকুর পালা ও ছবি রাখা ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। সেগুলোর যে অশুভ পরিণতি আছে, তা ভুলক্রমেও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে না। অথচ সেগুলো আপন সংগ্রহে রাখার অভিশাপে আমরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছি ফেরেশতাদের সঙ্গ ও সহায়তা থেকে, যাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী সব সময়ই; বিশেষত মৃত্যুর কঠিন ঘাঁটিতে।

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাযত থাকার আমল

মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা ও শঠতা থেকে হেফাযত থাকার জন্য কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ থেকে কিছু তদবীর জানা যায়।

প্রথম তদবীর হল- ঈমান ও আমলের পূর্ণতা ও পরিপক্কতা। যা উপরে উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়। এটিই সবচেয়ে বড় তদবীর।

দ্বিতীয় তদবীর হল- ইস্তিক্বামাত তথা ঈমানের উপর দৃঢ় ও বলবৎ থাকা। যেহেতু ইস্তিক্বামাতের অনেক স্তর আছে, সেহেতু ইস্তিক্বামাতের স্তর যে পরিমাণ এগিয়ে যাওয়া যায়, সে পরিমাণ শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা সহজ ও সম্ভব হয়।

ইস্তিক্বামাতের নিম্নস্তর হল- জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত আপন ঈমান ঠিক রাখা। তাতেও আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের নুসরত আশা করা যায়। তবে এ আশঙ্কাও আছে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তি তার জীবনের কোনো গুনাহের পরিণামে সেই সৌভাগ্য থেকে মাহরূম হয়ে যেতে পারে।

ইস্তিক্বামাতের উচ্চস্তর হল- সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা।

ইস্তিক্বামাতের মধ্যস্তর হল- অজান্তে গুনাহে জড়িয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আযাবের ভয় করা এবং তওবা ও ইস্তিগফার করা।

তৃতীয় তদবীর হল- জুনুবী অবস্থায় অযু ছাড়া অল্প সময়ও না কাটানো; বিশেষত শোয়ার সময়।

চতুর্থ তদবীর হল– দেহ, পোশাক ও বসবাসস্থলকে সেই সকল জিনিস হতে পাক-সাফ রাখা, যা ফেরেশতাদের প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন: ছবি, কুকুর, গোসলের হাজতওয়ালা ব্যক্তি ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

পঞ্চম তদবীর হল- পিতা-মাতার আনুগত্যপরায়ণ হওয়া এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।

হাদীস শরীফে আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হল। আরয করল যে, আমাদের বসতির এক যুবক মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাকে কালিমার তালকীন করা হয়েছে, কিন্তু সে তা পড়ার শক্তি পাচ্ছে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি কালিমা পড়ায় অভ্যস্ত নয়?'

লোকটি উত্তর করল, 'জি, সে তা নিয়মিত পাঠ করত।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এ-সময় কালিমা পড়তে না পারার কী কারণ?'

একথা বলেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই যুবকের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাকে কালিমার তালকীন করলেন।

যুবকটি বলল, 'আমি তা পড়তে পারছি না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটির কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

যুবকটি বলল, 'আমি আমার মায়ের অনেক অবাধ্যতা করেছি। তাঁকে বহু কষ্ট দিয়েছি।'

এরপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের থেকে তাকে ক্ষমা করিয়ে নিলেন। ফলে যুবকের মুখ খুলে গেল। আর সে কালিমা পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল।

ষষ্ঠ তদবীর হল- মৃত্যুর সময় আশপাশের লোকজন কর্তৃক মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে বসে তাকে কালিমার তালকীন করা।

মাসআলা : তালকীনের উত্তম পদ্ধতি হল, মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে বসে একজন কালিমা পড়তে থাকবে। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কালিমা পড়ার নির্দেশ দেয়া হবে না। কারণ, সেটা নাযুক মুহূর্ত। মৃত্যুরোগী কষ্ট ও যন্ত্রণায় কাতর। অতিশয় দুর্ভোগের কারণে কালিমা পড়া থেকে অস্বীকারও করে

বসতে পারে। তাই তার পাশে বসে একজন নিজে থেকেই কালিমা পড়তে থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যখন তোমরা মৃতপ্রায় মানুষের কাছে বস, তাকে কালিমা পড়তে পীড়াপীড়ি করো না। কেননা কখনও সে তা পড়ে নেয় মুখে, কখনো হাতের ইশারায়, কখনো চোখে, কখনো বা অন্তরে। (আর এতটুকুও যথেষ্ট)

শায়খ আবদুল বাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যদি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কারও মুখ বন্ধ হয়ে যায় অথবা অসুস্থতার দরুন কেউ বেঁহুশ হয়ে পড়ে এবং কালিমা পড়ার সুযোগ না পায় তাহলে তার উপর তার পূর্ব অবস্থার হুকুম বহাল থাকবে। যদি পূর্বে সে কালিমা পাঠকারী হয়ে থাকে তবে তার উপর মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ার হুকুম দেয়া হবে।

মাসআলা : মৃত্যুরোগী একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিলে তাকে পুনরায় তালকীন করার কিংবা কালিমা পড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে কালিমা পাঠ করার পর সে দুনিয়াবী কথাবার্তায় মশগুল হলে তাকে পুনরায় তালকীন করা হবে।

হাদীসের কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, কালিমায়ে তাইয়্যেবা তালকীনের সময় নিম্নোক্ত বাক্যও বলা হবে,

الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله.

'ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাক, আল্লাহ ছাড়া শক্তির আর কোনো উৎস নেই।'

সপ্তম তদবীর হল- মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা; বিশেষত সূরা ইয়াসীন। কুরআন পড়ার বরকতে শয়তানের জাল ও ফাঁদ থেকে হেফাযত থাকা যায় এবং মৃত্যুকষ্ট উপশম হয়।

হাদীস শরীফে আছে, 'যখন কোনো মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা হয় তখন আল্লাহ তার মৃত্যুকষ্ট লাঘব করে দেন।'

অন্য হাদীসে হযরত মা'ক্বাল ইবনে ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'তোমরা মরণাপন্ন ব্যক্তির নিকটে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করো।'

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে সূরা রা'দ তিলাওয়াত করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা তা পাঠ করা হলে মুমূর্ষু ব্যক্তির কষ্ট কম হয় এবং তার রূহ কবয সহজ হয়।

উপসংহার

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন, উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত হল, যে সকল লোক অভ্যন্তরীণভাবে অবিরাম গুনাহ করেই চলে, কবিরা গুনাহেরও পরোয়া করে না তাদেরকেই শোচনীয় পরিণতির শিকার হতে হয়। পক্ষান্তরে যারা নেক আমলে অভ্যস্ত থাকে তাদেরকে অশুভ পরিণতির শিকার হতে দেখা যায় নি।

أما من كان على قدم الاستقامة في الظاهر و لم يصر على المعصية في الباطن فما سمعنا و لا علمنا أن مثل هذا يختم له بسوء أبدا ولله الحمد، بخلاف من غلب عليه حب المعاصي والوقوع فيها من غير توبة، فربما نزل عليه الموت قبل التوبة، فيصدمه الشيطان عند تلك الصدمة، فيظهر شقاءه للناس.

'যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইস্তিক্বামাতের উপর থাকে এবং অপ্রকাশ্যেও গুনাহ করতে থাকে না, আমরা তার সম্পর্কে কখনো শুনি নি এবং জানতেও পারি নি যে, এমন ব্যক্তির শেষ পরিণতি খারাপ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

পক্ষান্তরে পাপপ্রবণতা ও পাপাচার যার জীবনে ছেয়ে যায়, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর রীতিমতো যে তওবাও করে না, এমন ব্যক্তির অনেক সময় তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যায়। সুতরাং শয়তানের মুকাবিলায় সে অক্ষম ও অপারগ হয়ে পড়ে। ফলে তার দুর্ভাগ্য মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে যায়।' (মুখতাসার তাযকিরায়ে কুরতুবী, পৃষ্ঠা ১৩)

সারকথা, (আল্লাহ হেফাযত করুন!) যে সকল লোকের শেষ পরিণাম শোচনীয় দেখা যায়, তাদের করুণ দশায় আপতিত হওয়া মৃত্যুর ছটফটানির দরুন নয়; বরং পূর্ব হতেই তাদের ঈমান ও আমল খারাপ ছিল, যার বহিঃপ্রকাশ মাত্র ঘটেছে সেই মুহূর্তে। এটি আদৌ নয় যে তাদের সেই দুরাবস্থা মৃত্যু-মুহূর্তের সৃষ্টি।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা

বহুসংখ্যক হাদীস এ কথার সাক্ষ্য বহন করে, মৃত্যুর ছটফটানির সময়কার ঈমান কিংবা কুফর উভয়টির কোনোটিই ধর্তব্য নয়।

কাজেই প্রশ্ন হল, মৃত্যুর সময় শয়তানের আগমন ও তার বিভ্রান্ত করা যখন নিরর্থক, অতএব (আল্লাহ না করুন!) কেউ যদি সে সময় কোনো কুফরী কালিমা মুখে বলে ফেলে তাহলে তা তার ঈমানের উপর প্রভাব ফেলার কথা নয়। এমতাবস্থায় শয়তানের ব্যাপারে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন থাকার অর্থ কী?

এর উত্তর এই যে, রূহ কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে বান্দার আমলনামা লেখা হতে বিরত থাকা হয়। তবে তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ঈমান ও কুফর ধর্তব্য ও বিবেচিত। শয়তান মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সে সময়ই ধোঁকা দিতে চায়, যখন সে বুঝতে পারে যে. মৃতপ্রায় ব্যক্তির এখতিয়ার এখনও বাকি আছে এবং সে এখনও শরীয়তের আদেশ-নিষেধের আওতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং এ-রকম ব্যক্তিরই ঈমান ও কুফর বিবেচনার বিষয়।

হ্যাঁ, এটি ভিন্ন বিষয় যে, সে সময় মুমূর্ষু ব্যক্তি ধোঁকায় পতিত হয়ে যায় এবং মৃত্যু-মুহূর্ত সে উপলব্ধি করতে পারে না।

তবে যেহেতু আশপাশের লোকজনের এ পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন যে, মৃতপ্রায় মানুষের মুখে আওড়ানো কালিমা কি তার মৃত্যু-মুহূর্তের ছিল না পূর্ব মুহূর্তের; সেহেতু (আল্লাহ না করুন!) যদি কোনো মুসলমানের মুখে সে সময় কুফরী কালিমা এসে যায়, তবুও তার উপর কুফরীর হুকুম আরোপিত হবে না।

اللهم إنا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسألك بوجهك الكريم وجاه رسولك الرحيم أن أنجنا وجميع المسلمين و المسلمات من سوء الخواتيم و أن ترزقنا حسن العواقب وأن تتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.

আন-নাঈমুল মুক্বীম

একজন পরলোকগামী বুযুর্গের বিরল ও বিস্ময়কর কাহিনী

মৃত্যুর সময় শত্রু-মিত্রের মুকাবিলা
মাওলানা মুহাম্মদ নাঈম দেওবন্দীর ঈর্ষণীয় মৃত্যু

شہید عشق جی جاتے ہیں جی سے کیا گذرتے ہیں
خدا یہ موت دے سب کو ہم اس مرنے پہ مرتے ہیں

'মাওলার প্রেমে মরা ব্যক্তির চিত্ত-চাঞ্চল্যের কী প্রয়োজন?
হে মাওলা, আমাদের সকলকেই দান করো শহীদী মরণ!'

একজন আল্লাহওয়ালা বলেছেন, 'অনেক জীবিত মানুষ এমন আছে, তাদের আলোচনায় অন্তরে কাঠিন্য ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়। আবার অনেক মৃত মানুষ এমন আছে, তাদের আলোচনা হৃদয়কে করে তোলে সজীব ও প্রাণবন্ত।'

পরলোকগামী যে মনীষীর আলোচনা পেশ করার প্রয়াস আমি করেছি, নিঃসন্দেহে তিনি উপরে উল্লেখিত সৌভাগ্যশীলদেরই একজন। তবে এই বুযুর্গ উলামায়ে কিরামের কাছে প্রখ্যাত ছিলেন না। তিনি পরিচিতমুখও নন সুফিয়ায়ে কিরামের মাঝে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর সামান্য বৃত্তান্ত প্রয়োজনবোধ করি।

মাওলানা নাঈম দেওবন্দী মাওলানা বশীর আহমদের সৌভাগ্যবান সন্তান। তাঁর বাবা মাওলানা বশীর আহমদ হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি-স্থাপনকারী হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন হযরত মাওলানা ক্বাসেম নানুতুবীর নিকটতম ব্যক্তি এবং বিশেষ মুরীদীনদের অন্যতম।

মরহুম মাওলানা আমার আব্বাজানের চাচাত ভাই হওয়ার সুবাদে সম্পর্কে তিনি আমার চাচা হন। অবশ্য বয়সের বিচারে তিনি আমার ছোট।

তিনি নিজেকে আমার ছাত্র হিসেবে ভাবেন; কিছু কিতাবপত্র আমার থেকে ধরে নেয়ার অজুহাতে। কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে ইলম ও আমলের যে খাযানা দান করেছেন, তা আমার জন্য সব সময়ই ঈর্ষার বিষয়।

জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি যে হালতের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বড় বড় মানুষকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তোলে। বাস্তবিকই এ পরলোকগামীর হায়াত ও মউত মনোমুগ্ধকর উপদেশ। তাই তাঁর জীবনের কিয়দংশ উল্লেখ করছি।

তিনি সম্ভবত ১৩৫২ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করেন। আল্লাহ তো তাঁকে সেই দলভুক্ত করেছেন যাদের ব্যাপারে ইরশাদ আছে,

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ.

'আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম।' (সূরা সোয়াদ, আয়াত ৪৬)

এজন্যই মাওলানার শিক্ষাজীবনে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই ফুটে উঠত ইলম ও আমলের বিপুল আগ্রহ। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে কুরআন শরীফ হিফয করে নিয়েছিলেন। ফারেগ হওয়ার পর দিন-রাতের ব্যস্ততাই ছিল কুরআনকে ঘিরে। ইলমে তাজবীদে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে মুরাদাবাদ সফর করেন। বেশ কিছু সময় সেখানে অবস্থান করে এ-বিদ্যা শেখা সম্পন্ন করেন।

এরপর ১৩৫৪ হিজরীতে মুরাদাবাদ ইমদাদিয়া মাদরাসাতে শিক্ষকপদে খেদমতে যোগদান করেন।

১৩৫৬ হিজরীর শাবান মাসে মাদরাসা ছুটি হলে তিনি বাড়িতে আসেন। তখন জানা গেল যে, তাঁর শরীরে জ্বর উঠানামা করছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। শুরু হল চিকিৎসা। ক্রমান্বয়ে দিন দিন শরীর ভেঙ্গে এল। কিন্তু তারাবীহসহ সকল নামাযই জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন মসজিদে গিয়ে।

জিলক্বদ মাসের প্রথমভাগে যখন চলাফেরা করতে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়লেন এবং চিকিৎসকগণও যখন তাঁকে চলাচল থেকে কড়াভাষায় নিষেধ করলেন তখন ঘরে নামায পড়া শুরু করলেন। ঘরে অবস্থান করায় যিকির ও তিলাওয়াতের ফুরসত আরও বেড়ে গেল। এ হালতেই প্রায় ১৭ দিন অতিবাহিত হল।

১৮ই জিলক্বদ রোজ শুক্রবার সকালে আমি অধম তাঁর কাছে হাজির হলাম। রাতভর অনিদ্রা ও অস্থিরতায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আমাকে জানালেন যে 'তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে, তবে বুকে সামান্য জ্বালাপোড়া।' অবশ্য সে সময় আগত চিকিৎসকগণ তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন। বারবার তিনি আমার কাছে আরজি পেশ করছিলেন, আমি যেন তাঁকে পড়ার মতো কিছু বলে দিই। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনার স্বস্তি অনুভূত হলে এবং মনও চাইলে لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين পড়বেন।

আসরের সময় বারবার বমিভাব হচ্ছিল। নামায আদায় করার ফুরসত পাচ্ছিলেন না। আমাকে ডেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ পরিস্থিতিতে তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর (অপারগ) হিসেবে পরিগণিত হবেন কি না?' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'তুমি এখন মাযুর হিসেবে ধর্তব্য। এ হালতেই তুমি নামায পড়তে পারো।'

তখন পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎ পরিমণ্ডলেই বিচরণ করছিলেন। ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, বমিভাব কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে নামায আদায় করে নিবেন। কিন্তু এরই মাঝে অন্য আরেকটি জগৎ তাঁর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

মাগরিবের নামায সেরে আমি ঘরে পৌঁছলাম। উপস্থিত লোকজন আমাকে বলল, কিছু সময় পূর্ব থেকে তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছে। তিনি এলোমেলো কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে ভালোভাবে চিনলেন। আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আমি যেন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দুআ-দুরূদ পাঠ করি এবং হযরত মিয়া সাহেবের (দেওবন্দ মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আসগর হুসাইন) নিকট তাঁর সালাম পৌঁছে দিই।

ক্ষণকাল পরেই দুষ্টু শয়তানের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ শুরু হল। সে বিতর্ক আমার উপস্থিতিতেই চলল প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। এ হালতেই তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই খবিশটা আমাকে বিরক্ত করছে সেই আসর থেকে।' সে মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে, উপস্থিত লোকজন যেই কথাবার্তাকে প্রলাপ বুঝেছে, তা ছিল এই পাপাত্মার সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক।

মরহুম মাওলানার নিকটে অবস্থানকারী তাঁর সহোদরা ও আগত পুরুষ-মহিলারা আমাকে অবহিত করল, মাগরিবের কিছু সময় পূর্বে (যা বিভিন্ন হাদীস ও আসারের বর্ণনামতে জুমআর দিনের দুআ কবুলের সময়) তিনি প্রথমে নিজের দুই দিনের কাযা নামাযের ব্যাপারে অসিয়ত করলেন; এরপর আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন কায়মনোবাক্যে। হাত তুলে বিগলিত হৃদয়ে বলতে শুরু করলেন, 'হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি বড় গুনাহগার। জীবন-যাপন করেছি গাফলতির মাঝে। আমার আমল-আখলাকও ত্রুটিযুক্ত। আমার দেহাবয়বও কলঙ্কজড়িত। কোন্ মুখ নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হব আমি? কিন্তু তুমি তো ইরশাদ করেছ,

سبقت رحمتي على غضبي.

'আমার রহমত আমার গযবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।'

তাই আমি তোমার রহমতের আশাবাদী।

তাঁর মিনতিভরা দুআ উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভাবাবেগ তৈরী করল। দুআ শেষ না করেই হঠাৎ উচ্চস্বরে তিনি বললেন, 'আমি তায়াম্মুম করব।'

তাঁর বোন মাটির ঢেলা সামনে পেশ করলেন। তায়াম্মুম করেই তিনি বলতে লাগলেন, 'শয়তান! দাঁড়া, তোকে বলছি! তুই আমাকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করতে এসেছিস? আমি কখনও হতাশ হব না। তাঁর রহমতের উপর ভরসা করেই তোকে বলছি, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব। খবিশ, তুই আমাকে বিগড়াতে এসেছিস মোটা একটি কিতাব নিয়ে! আমি ১৭ দিন মসজিদে যেতে পারি নি বলেই তোর স্পর্ধা এত বেড়েছে! শুনে রাখ, আমার সে অনুপস্থিতি আল্লাহর হুকুমেই ছিল।'

এরপর তিনি কুরআনের আয়াত–

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

পর্যন্ত পড়লেন। আগে বেড়ে وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ পড়তে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মুখে জড়তা এসে গেল। তারপর খুব জোর খাটিয়ে বারবার পড়লেন–

وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

এরপর শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বজ্জাত কোথাকার, তুই আমাকে এই সুসংবাদবহ আয়াত ভুলাতে চাচ্ছিস? আমি তো তা ভুলতে

পারি না। এই আয়াত আমাকে হযরত মিয়া সাহেব শিখিয়ে দিয়েছেন।* মৌলভী শফীও আমাকে তা বাতলিয়ে দিয়েছেন।' এরপর বারবার তিনি উচ্চস্বরে وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ পড়লেন। ফলে তখন কামরা হয়ে উঠেছিল শব্দায়মান।

তাঁর এইসব কথাবার্তা আমার পৌছার পূর্বেই হয়েছিল। উপস্থিত লোকজন যা প্রলাপ মনে করছিল। কিন্তু আমি সেখানে পৌছলে তিনি আমাকে ভালোভাবে চিনলেন। খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। দুআ চাইলেন। মিয়া সাহেবের কাছে তাঁর সালাম পেশ করার অসিয়ত করলেন।

তাঁর এ-যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণের ফলে আমি স্পষ্টভাবে বুঝলাম যে, কিছু সময় পূর্বে তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না, বরং শয়তান দৃষ্টিগোচর হওয়ায় মুকাবিলা করছিলেন ওর সঙ্গে। এ-কারণেই আমি উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আমাকে বলছিলেন, 'এই বজ্জাতটা আমাকে জ্বালাতন করছে সেই আসর থেকে।' আমি তাঁকে لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم এর তালকীন করলাম। তিনি তা পাঠ করলেন উচ্চস্বরে।

এরপর ইবলীসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খবিশ! দাঁড়া, তোকে বুঝাচ্ছি! তোর কত বড় স্পর্ধা! তুই আমাকে ফুসলাতে এসেছিস। জেনে রাখ, আমার দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গেঁথে আছে। আমার শিরা-উপশিরায় 'আল্লাহ আল্লাহ' বাসা বেঁধে আছে।'

উপস্থিত লোকদের কেউ একজন এ সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তা মুখে আওড়িয়ে তিনি বললেন, আগে বললে না কেন?

ঘন ঘন রক্তবমি হচ্ছিল। ফুরসত পেলেই কখনো لا إله إلا الله محمد رسول الله পুরোপুরি পড়ছিলেন। কখনো لا حول ولا قوة إلا بالله পড়ছিলেন। কখনো لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين পড়ছিলেন। কখনো বা শয়তানকে

---

* পাদটীকা : মাওলানা নাঈম দেওবন্দীর মৃত্যুর দু-চার দিন পূর্বে দেওবন্দ মাদরাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব তাঁর খোঁজখবর নিতে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তখনই হযরত তাঁকে সে আয়াতের অযীফা বাতলিয়ে দিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, 'খবিশ! তুই এখনও যাস নি?' মাঝেমধ্যে আমাকে সম্বোধন করে বলছিলেন, 'ওকে মার, ওকে বের করে দাও।'

সেই মুহূর্তে ছয় মাসের পীড়িত ব্যক্তিটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি এখনই বুঝি লড়বার অভিপ্রায়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। একবার বললেন, 'তুই মনে করেছিলি, এটি নাযুক মুহূর্ত। এ সময় আমাকে ধর্মচ্যুত করবি। দেখ, আমার শরীরে উষ্ণতা এসে গেছে। দাঁড়া, তোকে আমি এখনই বুঝাচ্ছি!'

এরপর বললেন, 'এই যে অনেক মানুষ দণ্ডায়মান।' (অথচ তাঁর সামনে মাত্র দুজন দাঁড়িয়ে ছিল)। তাঁর কথায় মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ফেরেশতাদের দেখতে পাচ্ছিলেন। সম্ভবত ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, ঠিক আছে, আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে চল।

এ ধরনের কথাবার্তা এশার পর পর্যন্ত গড়াল। মাঝে মাঝে তিনি কালিমায়ে তাইয়্যেবা পুরোপুরি পড়ছিলেন। অবশেষে তাঁর জীবন-নদীর ঘাটে এসে ভিড়ল মৃত্যুর ভেলা। রাত নয়টার দিকে চলে গেলেন মাওলার পরম সান্নিধ্যে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজনকে 'সবরে জামীল' দান করুন এবং তাঁর বরকত দ্বারা তাদের পরিবেষ্টন করুন। আমীন!

এটি এমন এক মৃত্যু, শতসহস্র জীবন যার উপর কুরবান।

আল্লাহ আমাদের ও সকল মুসলমানকে ঈমানী মউত দান করুন। আমীন!

বান্দা মুহাম্মাদ শফী
মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ।